নতুন জীবন

শুজা রশীদ

ঢাকা ফিরে আসার পরপরই বাবাকে যশোরে পোষ্টিং দেয়া হলো। আমাকে এই অবস্থায় ফেলে সেখানে বাবার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি আমার নাজুক অবস্থা ব্যাখ্যা করে তার পোষ্টিং পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করলেন। তাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট হসপিটালে যোগ দিতে বলা হলো। আমরা সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বাবা মীরপুর এক নম্বরে বাসা ভাড়া করলেন। বেশ কয়েকটি বহুতল ভবন আছে সেখানে। আমরা উঠলাম বিল্ডিং নম্বর 'ঙ' তে, চারতলায়। আর্মি কোয়ার্টার ঝট করে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। আমরা আমাদের নতুন বাসাতেই মন বসানোর চেষ্টা করলাম। বহু মানুষের বাস প্রতিটি দালানে। বাসা গুলিও বেশ ছোটই। আমাদেরটা মাত্র এক বেডরুমের। লিভিং রুমটায় বিছানা পেতে দ্বিতীয় বেডরুম করে ফেলা হলো। তবে মন্দের ভালো এই যে নীচে পেছনে ছোট্ট একটুকরো জমি পাওয়া গেলো চাষাবাদের জন্য। মা কোনরকম সময় নষ্ট করলেন না। মাটি কুপিয়ে শাক-সবজি লাগিয়ে ফেললেন। এখন রুশী তাকে সাহায্য করে। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে রুশীর কাছ থেকে জানতে পারি প্রতিদিনের অগ্রগতি। প্রচুর বাচ্চা-কাচ্চা থাকায় রুশী ও মিল্কীর আনন্দ আর ধরে না। পাশের বাসাতেই রুশীর বয়েসী একটি মেয়ে আছে। তাদের দু'জনার এখন গলায় গলায় ভাব। এতে লাভের লাভ এই হয়েছে যে রুশীর নাকি কান্না কমেছে।

আমার পায়ের ভাঙা হাড় জোড়া লাগবার পথে। ঢাকা এসে আবার প্লাস্টার খোলা হয়েছিলো। কিছু পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে আবার নতুন প্লাস্টার চড়ানো হলো। এখানকার বড় ডাক্তাররা বললেন হাঁড় দু'খানা ঠিক মুখামুখি জোড়া না লাগলেও বিশেষ সমস্যা হবে না। বাচ্চার বয়স কম। সময়ের সাথে সাথে পা খানা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই কর্মক্ষম হয়ে উঠবে। বাবার প্রধান ভয় ছিলো পাটা অন্য পায়ের চেয়ে ছোট না হয়ে যায়। তাকে বলা হলো তার ভয় অমূলক। আমরা সবাই আশায় বুক বাঁধলাম। বিশেষ করে আমি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটার কথা চিন্তা করলেও বুকটা হু হু করে ওঠে। ঐ রকম পা নিয়ে কি ফুটবল খেলতে পারবো? বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানান রকম দুশ্চিন্তা করি। বাবা আমাকে বেশ কিছু বই এনে দিলেন। ধীরে ধীরে সেগুলোর মধ্যে মজে যেতে শুরু করলাম। রাশিয়ান শিশু-কিশোরদের গল্পগুলো পড়ে অভিভুত হয়ে গেলাম। 'মালাকাইটের ঝাঁপি' নামে একটা বই উপহার পেয়ে চোখ টলমল করে উঠলো। সেই বইটা বিছানায় শুয়ে কতবার পড়েছি হিসাবও নেই। খুব দ্রুত বাস্তব থেকে দূরে অথচ বাস্ত বকে সঙ্গী করে কল্পনার যে অসম্ভব সুন্দর এক জগৎ রয়েছে তার মোহতে জড়িয়ে গেলাম। আমার বিছানার পাশে বইয়ের পাহাড় জমতে লাগলো। অবশেষে প্রায় মাস তিনেক পরে সেই শুভদিন এলো। আমার পায়ের প্লাষ্টার খোলা হলো। ডাক্তাররা সব দেখে-টেখে বললেন ঠিকই আছে। প্রথম কয়েকটা দিন হাঁটার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। পায়ের উপর চাপ দিতেই ভয় করে। এটাকে নিজের পা বলে মনে হয় না। কিন্তু ধীরে ধীরে ভয়টা কেটে যেতে লাগলো। এক পা দু'পা করতে করতে সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করলাম। অবাক হয়ে

আবিষ্কার করলাম রুশী ভুল কিছু বলেনি। ভীড়-ভাট্টা থাকলেও কলোনিতে থাকার অন্য আনন্দ আছে। কয়েক দিনের মধ্যে আমার ডজন খানেক বন্ধু হয়ে গেলো। মীরপুরে উম্মুক্ত প্রান্তরে আমরা দল বেঁধে ছুটাছুটি করি, ঘন্টার পর ঘন্টা ফুটবল খেলি, চলে যাই অদুরেই অবস্থিত চিড়িয়াখানায়, নতুবা পেছন দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটার তীরে। হঠাৎ করেই জীবন যেন তার সম্পূর্ণ রূপ উন্মোচন করে দিলো আমার সামনে। এখানে এই ঢাকাতে প্রকৃতির এমন নৈকট্য পাবো কে ভেবেছিলো? সুযোগ পেলেই মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কলোনির বন্ধুদের কাউকে না কাউকে পাওয়াই যায়। আমরা বেরিয়ে পড়ি নতুন রোমাঞ্চের আশায়। মায়ের বকুনি কিংবা বেধড়ক পিটানি কোনটার ভয়ই আমাদের পিছু টানে না। আমার বাল্যকাল আর মিল্কীর শৈশবকাল একসাথে মিলে মিশে চমৎকার একটি সমন্বয় তৈরি করে। বড় ভাইয়াকে সে ভয়ানক চিনেছে। ছায়ার মতো সেঁটে থাকে। আমিও তাকে ছাড়া কোথাও যাইনা। মীরপুর দুই নম্বরে একটা কিন্ডার গার্টেন স্কুলে আমাদেরকে ভর্তি করিয়ে দিলেন বাবা-মা। আমি ফোরে, রুশী টুতে, মিল্কী প্লে গ্রুপে। স্কুলের আয়া এসে আমাদেরকে নিয়ে যায়, আবার স্কুল শেষে দিয়ে যায়। স্কুলেও বেশ কিছু বন্ধু জুটলো। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে বুড়িচ্ছু খেলবার স্বাদ পেলাম আবার। স্কুল থেকে ফিরে কোন রকমে হোম ওয়ার্ক সেরে অপেক্ষা করি কখন বিকেল হবে, কখন ছেলেরা সবাই বের হবে। আমার নাম ধরে ডাকলেই আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কোন রকমে জুতাটা পায়ে গলিয়েই ছুট দেই। মিল্কী জানে ব্যাপারটা দ্রুত ঘটবে সুতরাং সে জুতা পরেই থাকে। মা আমাদের নাগাল পাবার আগেই আমরা পগার পার। মীরপুর চিড়িয়াখানায় যাবার চিকণ রাস্তাটার অন্য পাশে ধু ধু মাঠ। সেখানেই আমাদের জমজমাট ফুটবল খেলা চলে গোধুলি লগ্ন পর্যন্ত। হৈ চৈ, ছুটাছুটি, কালে ভদ্রে মারামারি - প্রতিদিনই মহাফুর্তি। বাসায় ফেরার পর কানে টান লাগে। মা চোখ মোটা মোটা করে বলল - তখন যে ডাকলাম শুনলি না কেন? আমাদের বিড়ম্বনা দেখে রুশীর হাসি আর ধরে না।

খুব শীঘ্রই আমাদের জীবনে বেশ বড়সড় একটা পরিবর্তন এলো। আর্মির কাজ বাবার তেমন একটা ভালো লাগছিলো না। প্রথমত অনেক জুনিয়র অফিসারেরা হয় তার সমকক্ষ নতুবা উপরের র‍্যাংকে চলে গেছে। দ্বিতীয়ত স্বাধীনতাও কম। কখন কোথায় পোষ্টিং হয় কোন ঠিক নেই। ক্যাপ্টেন সুজনের বিচারের সময়েও বেশ খানিকটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিলো। ক্যাপ্টেন সুজন ও তার বন্ধুরা বাকিদেরকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলো। বাবা অবশ্য অল্পতে ভয় পাবার মানুষ নন। তিনি যথারীতি সাক্ষী দিয়েছিলেন। যদিও পরিশেষে কোন একভাবে ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে যায়। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে আর্মিতে থাকবার আগ্রহ বাবা হারিয়ে ফেলেছিলেন। সমস্যা হচ্ছিলো সম্মান নিয়ে বেরিয়ে আসা নিয়ে। বাবা ঢুকেছিলেন ১৯৭০ সালে। ১৯৮০ সালের আগে স্বাভাবিক নিয়মে তার রিটায়ার করার কোন উপায় নেই। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি বাংলাদেশ সরকার একটি সুযোগ দিলেন ভলান্টারি রিটায়ারমেন্টের। বাবা সুযোগটা লুফে নিলেন। আর্মির কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি জেনারেল প্রাকটিশনার হিসাবে ডাক্তারী প্রাকটিস করতে শুরু করলেন। এলাকার নতুন ডাক্তার হিসাবে তার পরিচিতি প্রায় নেই বললেই চলে। তারপরে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ

সুবিধার নয়। মানুষ জনের হাতে টাকা পয়সা অঢেল নয়। বাবা একটি ঔষধের দোকানে সকাল বিকাল বসেন। রোগী অল্পই পান। আমাদের অর্থনৈতিক টানা-পোড়েন শুরু হয়। আচার খাবার জন্য দশটা পয়সা পেতেও অনেক কাকুতি মিনতি করতে হয় মায়ের কাছে। কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক আনন্দের তাতে বিশেষ কমতি হয় না। বাকিতে আচার দেবার মতো ভালো মানুষ আচারওয়ালা ঠিকই পেয়ে যাই। সুযোগ বুঝে বাবার মানিব্যাগ থেকে একটা সিকি সরিয়ে ফেলে সারা সপ্তাহের ধার শোধ করে দেই। মনটা অপরাধবোধে ভরে থাকলেও এমন স্বাদালু টক মিষ্টি কুলের আচার আর দুধের আইসক্রিমের লোভ ছাড়তে পারি না। শুধু নিজে খেলেওতো চলে না, মিক্কীর জন্যেও নিতে হয়। মাঝে মাঝে রুশী আবদার ধরলে সেটাও রাখতে হয়। বড় ভাই হবার যন্ত্রণা কম নয়।

এভাবেই নানান সুবিধা-অসুবিধা, ভালো-মন্দ, বন্ধু-বান্ধব আর চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উম্মুক্ত প্রকৃতির ছোট বড় অঙ্গনকে ঘিরে আমাদের নতুন জীবনের এই ক্ষুদ্র স্রোত মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের আরো শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসারের স্রোতে। সুখ দুঃখের নানান স্তরের ভেতর দিয়ে আরো অনেক শিশু আর বালক বালিকাদের সঙ্গী হয়ে আমরা তিন ভাই বোন বেড়ে উঠতে থাকি। নিজেদের অজান্তেই আমরা বিলী ন হয়ে যাই এক বৃহত্তর জনসমুদ্রে।

মধুর স্মৃতি

কত বছর পেরিয়ে গেছে তারপর! কত বছর ! সম্ভব অসম্ভব কত পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছি, কত প্রিয় মানুষকে পেছনে ফেলে এসেছি, কত প্রিয় স্থানে কখনো আর ফিরে যাইনি। কত অসংখ্য বাধা আর বন্ধনে জড়িয়ে যাই আমরা সবাই। ইচছা থাকলেও কত কিছুই করা হয় না। সম্ভবত সেই কারণেই আমাদের অস্তিত্বের একটা অসাধারণ অংশ জুড়ে থাকে আমাদের স্মৃতি। আজ এতোদিন পরে, শৈশব ও বাল্যকালের সেই প্রান্তরগুলো থেকে কত দূরে দাঁড়িয়ে, নিজের শিশু সন্তানদের অবিরাম ছুটাছুটি আর লাফ ঝাঁপ দেখতে দেখতে মনটা কখন যেন ডুব দেয় স্মৃতির সরোবরে। সারি সারি দৃশ্যের ঘনঘটা হৃদয়টাকে পূর্ণ করে দেয়, মস্তিষ্কের পরতে পরতে বেজে উঠে এক সুদুরের ঘণ্টাধ্বনি - ঢং ঢং ঢং। এই দামামা যুদ্ধের নয়, এ ডাক মিলনের। বর্তমান, অতীত আর আমার সমগ্র অস্তিত্ব আচমকা এক যাদুতে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আচমকা এক আবেগের প্রবল তোড়ে ভেসে যাই, শিশু সন্ত ানদের হাত ধরে আমিও ছুটতে থাকি ঘরময়। আমার স্ত্রী বিস্মিত নয়ন মেলে তাকিয়ে থাকে। আমি কলকলিয়ে হেসে উঠি। সংকল্প করি - যেখানেই থাকি, যেভাবেই থাকি, একটি মধুময় শৈশব আর বাল্যকাল আমি তাদের উপহার দেবো। এই মধুর স্মৃতিগুলোর চেয়ে বড় সম্পদ বোধহয় মানুষের আর কিছু নেই।

কানাডা থেকে শুজা রশীদের লেখা দীর্ঘ স্মৃতি কথার এটি শেষ পর্ব। আসছে মে মাসে তার এ লেখাগুলো 'দামামা' নামে একটি বইতে নথিবদ্ধ হবে। আমরা তার এ বইয়ের সুনাম ও বাজার-সাফল্য কামনা করি।